বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য স্মৃতি বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী - ২০১১

পরিচালনায় ঃ বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া

(প্রথম পর্ব)

বিষয় ঃ হিরোসিমা থেকে ফুকুসিমা– পরমাণু বোমা থেকে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুর্ঘটনা– বিপর্যয়টা একই রকম

১. হিরোসিমা – জাপানের একটি ছোট শহর। ৬ আগস্ট ১৯৪৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই শহরে প্রথম পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। তাৎক্ষণিক ভাবে প্রায় এক লক্ষ মানুষের মৃত্যু সেদিন সমগ্র মানব সভ্যতাকে চমকে দিয়েছিল। এত বিধবংসী মারণাস্ত্র এর আগে কেউ কি কখনো দেখেছে! মৃত্যু-মিছিলের এখানেই শেষ নয়। এর ঠিক দু'দিন বাদে, অর্থাৎ ৯ আগস্ট ১৯৪৫ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের আর একটি শহর – নাগাসাকিতে দ্বিতীয় পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। নাগাসাকিতে তাৎক্ষণিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর হাজার। হিরোসিমার বোমাটি ইউরেনিয়াম - ২৩৫ এবং নাগাসাকির বোমাটি প্লুটোনিয়াম দিয়ে তৈরী ছিল। ধবংসের এখানেই শেষ ছিল না। ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয়তায় পরবর্ত্তী সময়ে ক্যান্সার ও লিউকিমিয়া প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করে। দীর্ঘকাল এই তান্ডব চলেছে। তেজস্ক্রিয়তার আরও একটি ভয়াবহ রূপ — বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম।

কিন্তু কেন এই বিস্ফোরণ ? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তো তখন প্রায় শেষ। জার্মান অনেক আগেই আত্মসমর্পণ করেছে। জাপানও তখন আত্মসমর্পণের পথে। তাহলে কি এই বিস্ফোরণের পেছনে যুদ্ধ ছাড়াও অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? ঠিক তাই! পরমাণু বোমার ধবংস ক্ষমতা ও পরিবেশের ওপর তার প্রতিক্রিয়া পরখ করা ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পৃথিবীর সামনে নিজেকে সবচাইতে শক্তিশালী হিসেবে তুলে ধরা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এরকম ঘৃণ্য ও হীন প্রবৃত্তির জন্য জাপানের কয়েক লক্ষ মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

২. ফুকুসিমাও জাপানের একটি সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর। এখানে রয়েছে জাপানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এখানে রয়েছে ছয়টি রিয়াক্টর বা পরমাণু চুল্লী, যাদের প্রত্যেকের উৎপাদন ক্ষমতা ১৬৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। গত ১১ মার্চ ২০১১ প্রবল ভূমিকম্প ও সুনামির কারণে এখানকার চারটি রিয়াক্টরে বড় মাপের দুর্ঘটনা ঘটে। বড় মাপের দুর্ঘটনা ঘটা মানে রিয়াক্টরের কেন্দ্রস্থল গলে যাওয়া এবং বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে, স্থলে ও বায়ুতে ছড়িয়ে পড়া। এখানেও সেটাই ঘটেছিল। তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুর সংখ্যা কম হলেও আগামী দিনে কী হবে তা চের্নোবিলের পরমাণু দুর্ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়।

ইউক্রেনের চের্নোবিল পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি রিয়াক্টরে ২৬ এপ্রিল ১৯৮৬ একটি বড় মাপের দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথমে কেন্দ্রস্থল গলে যায়, তারপর বিস্ফোরণে ওপরের অংশ ভেঙে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৩১। কিন্তু পরবর্তীকালে ক্যান্সার, লিউকিমিয়া প্রভৃতি মারণ রোগে মৃতের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী এখন পর্যন্ত চের্নোবিল কান্ডে মৃতের সংখ্যা নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার।

৩. পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ এবং বড় মাপের রিয়াক্টর দুর্ঘটনা — এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য প্রায় নেই বললেই চলে। উভয় ক্ষেত্রেই মূল কারণ একটাই – নিয়ন্ত্রণহীন পরমাণু বিভাজন বিক্রিয়া (Nuclear fission reaction)। ১৯৩৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অটোহান এবং স্ট্রাসম্যান লক্ষ্য করেন যে, একটি ২৩৫ ভরসংখ্যার ইউরেনিয়াম পরমাণুকে একটি অল্প বেগের নিউট্রন কণিকা দিয়ে আঘাত করলে ইউরেনিয়াম পরমাণুটি ভেঙে যায় এবং একই সাথে তৈরী হয় একটি বেরিয়াম ও একটি ক্রিপটন পরমাণুর নিউক্লিয়াস, তিনটি নিউট্রন কণিকা এবং ৩২ পিকো জুল শক্তি। এই ঘটনাকে বলা হয় পরমাণু বিভাজন বিক্রিয়া। মুক্ত নিউট্রন কণিকা তিনটি একই ভাবে আরও তিনটি ইউরেনিয়াম- ২৩৫ পরমাণুর বিভাজন ঘটাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ইউরেনিয়াম- ২৩৫ পরমাণু থাকবে ততক্ষণ এই বিক্রিয়া চলতেই থাকবে। এজন্য একে শৃংখল বিভাজন বিক্রিয়াও বলে।

ইউরেনিয়াম- ২৩৫ ছাড়া ইউরেনিয়াম - ২৩৩ ও প্লুটোনিয়াম- ২৩৯ পরমাণুও একইভাবে বিভাজন বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই দুটির কোনটিকেই প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। রিয়াক্টরের মধ্যে ইউরেনিয়াম- ২৩৫ এর বিভাজন বিক্রিয়ার সময় খুব সহজেই প্লুটোনিয়াম-২৩৯ তৈরী হয়। একটি স্বাভাবিক মানের রিয়াক্টরে বছরে প্রায় ৫০০/৬০০ পাউন্ড প্লুটোনিয়াম- ২৩৯ তৈরী হয়। কিন্তু ইউরেনিয়াম- ২৩৩ সহজলভ্য নয়। প্রকৃতি থেকে পাওয়া থোরিয়ামের সাহায্যে এটা তৈরী করা যায়। তবে এর পরিমাণ এতই অল্প যে, শৃংখল বিভাজন বিক্রিয়া চালানো সম্ভব নয়।

বিভাজন বিক্রিয়ায় তৈরী হওয়া তাপের পরিমাণ সত্যিই বিস্ময়কর। এক কি.গ্রা. ইউরেনিয়াম- ২৩৫ এর মধ্যে যত পরমাণু থাকে সেগুলি যদি বিভাজন বিক্রিয়ায় পরপর ভেঙে যায় তাহলে সব মিলিয়ে যে শক্তি (তাপশক্তি) তৈরী হবে তা দিয়ে $0^{o}C$ এর সাড়ে চার কোটি কি.গ্রা. বরফকে নিমেষে বাষ্পে পরিণত করা যায়। যখন কোন রকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়া উন্মুক্ত পরিবেশে এই বিক্রিয়া ঘটানো হয় তখন তার নাম পরমাণু বোমা।

রিয়াক্টরের মধ্যে যখন বিভাজন বিক্রিয়া ঘটানো হয়, তখন সমস্ত প্রক্রিয়াটাই থাকে নিয়ন্ত্রিত। রিয়াক্টরের মধ্যে তাপ কখনো অবস্থানের সুযোগ পায়না। রিয়াক্টরের মধ্যে সর্বদা একটি মুখ দিয়ে প্রবল চাপে ও বেগে তাপ-গ্রাহক পদার্থকে ঢোকানো হয় এবং আর একটি মুখ দিয়ে একইভাবে তা বেরিয়ে যায়। একে শীতক বা Coolant বলে। শীতকের মাধ্যমে প্রতিমুহূর্তে উৎপন্ন তাপকে বাইরে নিয়ে আসা হয় এবং এই তাপের সাহায্যে জলকে বাষ্পীভূত করে টারবাইন ঘোরান হয় যার ফলে বিদ্যুৎ তৈরী হয়।

রিয়াক্টরে বড় মাপের দুর্ঘটনা মানে কোন কারণে রিয়াক্টরের অন্তঃস্থল গলে যাওয়া। এরপর নানা উপসর্গ তৈরী হবে। সবশেষ পরিণতি বিস্ফোরণ। এই সমস্ত ঘটনার অর্থ দাঁড়ায় বিভাজন বিক্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারানো। একবার যদি কোন যান্ত্রিক বা অন্য কারণে রিয়াক্টরের মধ্যে শীতকের প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় বা ধীর গতিসম্পন্ন হয়, তাহলে উৎপন্ন তাপ রিয়াক্টর অভ্যন্তরে অবস্থানের সুযোগ পাবে এবং তখনই বিভাজন বিক্রিয়ার ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাবে।

৪. বিভাজন বিক্রিয়ায় রিয়াক্টরের মধ্যে তাপ ছাড়া বিভিন্ন রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী হয়। শৃংখল বিভাজন বিক্রিয়ায় যত নিউট্রন কণিকা তৈরী হয় তার সবগুলি বিভাজন বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে না। এ ধরণের অংশ নিতে না পারা নিউট্রন কণিকা বিভিন্ন ধরণের মৌলের পরমাণুর মধ্যে ঢুকে তাদের তেজস্ক্রিয় পরমাণুতে পরিণত করে।

৫. তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিন রকমের বিকিরণ নির্গত হয়। এরা যথাক্রমে আলফা, বিটা ও গামা বিকিরণ। এই বিকিরণগুলি চরিত্রগতভাবে আয়নীকারক, অর্থাৎ এই বিকিরণগুলি যদি কোন বস্তুর ওপর পড়ে তাহলে বস্তুর পরমাণুগুলির তড়িৎভারসাম্য নষ্ট হয় এবং তা আয়নে পরিণত হয়। বস্তুর পরিবর্তে যদি কোন জীবদেহের ওপর পড়ে তাহলে জীবকোষেও এরকম অনেক আয়ন তৈরী হবে যার ফলে জীবকোষের বিপাক ক্রিয়া নষ্ট হতে পারে এবং কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোম ও জিনেও নানা পরিবর্তন ঘটতে পারে। এসবকিছুই মানুষ তথা জীবজগতের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক।

৬. বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পরমাণু থেকে বিভিন্ন সময় ধরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ নির্গত হয়। এটা নির্ভর করে তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধজীবনের (Half life) ওপর। ধরা যাক্ স্ট্রনসিয়াম - ৯০। এর অর্ধজীবন ২৮ বছর। এর অর্থ যে কোন পরিমাণ স্ট্রনসিয়াম -৯০ কোন পাত্রে রেখে দিলে ২৮ বছর ধরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের মাধ্যমে অর্ধেক পরিমাণে পরিণত হবে। কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের কম করে দশটা অর্ধজীবন না পেরোলে মৌলটি তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত হয় না। যেমন স্ট্রনসিয়াম- ৯০ কে তেজস্ক্রিয়তা থেকে মুক্ত হতে ২৮০ বছর লাগবে। প্রকৃতিতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ৯২টি হলেও তেজস্ক্রিয় পরমাণু অসংখ্য রকমের। এর কারণ এক একটি মৌলের বিভিন্ন ভরসংখ্যার পরমাণু রয়েছে। এদেরকে আইসোটপ বলা হয়। যেমন স্ট্রনসিয়ামের কথাই ধরা যাক। এর আইসোটপের সংখ্যা ১৭টি যার মধ্যে চারটি প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এরা স্থায়ী এবং তেজস্ক্রিয় নয়। বাকী ১৩টিকে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। এরা তেজস্ক্রিয় এবং অস্থায়ী। কেন্দ্রিন বিক্রিয়ায় এদের তৈরী করা যায়।

৭. বর্তমান ভূ-উষ্ণায়নের জন্য যে সবুজ গ্যাসকে সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করা হচ্ছে সেই কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সামাজিক ও পরিবেশগত প্রয়োজন রয়েছে। বায়ুতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড না থাকলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাবে। শুধু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নয়, প্রায় প্রতিটি বর্জ্য পদার্থেরই সামাজিক বা পরিবেশগত প্রয়োজন আছে। একমাত্র ব্যতিক্রম তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতি করার ক্ষমতা ছাড়া এর কোনরকম সামাজিক বা

পরিবেশগত প্রয়োজন নেই। এজন্যে রিয়াক্টরে তৈরী হওয়া তেজস্ক্রিয় বর্জ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে জমিয়ে রাখা ছাড়া এখনো পর্যন্ত অন্য কোন উপায় নেই। কিন্তু এভাবে কত বছর জমিয়ে রাখতে হবে? শত শত -- হাজার হাজার - লক্ষ লক্ষ বছর!

৮. একটি রিয়াক্টরের জীবনকাল বড়জোর ৩৫ থেকে ৪০ বছর। এই সময়ের মধ্যে পুরো রিয়াক্টরটি তেজস্ক্রিয় পিন্ডে পরিণত হয়। এখান থেকেও তৈরী হয় বিপুল পরিমাণে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য। এমনিতেই রিয়াক্টর চালিয়ে পরমাণু বিদ্যুৎ তৈরীর যাবতীয় খরচ অন্যান্য যে কোন পদ্ধতিতে (জলবিদ্যুৎ, জীবাশ্ম জ্বালানী নির্ভর বিদ্যুৎ) তৈরী বিদ্যুতের খরচ অপেক্ষা অনেক বেশি। পরমাণু বিদ্যুতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বাড়তি খরচ তেজস্ক্রিয় আবর্জনাকে জমিয়ে রাখার খরচ। এখরচ হিসেব করাও শক্ত। কারণ কবে শেষ হবে তা কারো জানা নেই।

৯. তেজস্ক্রিয় রশ্মি ছাড়া আরও অনেক ধরণের আয়নীকারক রশ্মি আমরা প্রকৃতিতে পেয়ে থাকি। এদের মধ্যে অতিবেগুনী রশ্মি খুবই উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর কাছে সূর্যের বিকিরণ এই রশ্মির প্রধান উৎস। বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর এই রশ্মির প্রধান শত্রু। পৃথিবী যখন সূর্যের চারপাশে কক্ষপথে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল, তখন পৃথিবীর ওপর আজকের মত জল, মাটি, বায়ু, পাহাড়-পর্বত ও জীবজগৎ ছিল না। পৃথিবীর প্রথম ১৫০ কোটি বছর কেটেছে রাসায়নিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। এই পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা ছিল সৌরতাপের। তখন তাপ ও তাপমাত্রা উভয়ই ছিল অনেক বেশি। কারণ বায়ুমন্ডলের বাধা তখন ছিল না। এই পরিবর্তনের পথ ধরে প্রথম তৈরী হয়েছিল জলমন্ডল ও অক্সিজেনহীন আদিম বায়ুমন্ডল। জলের মধ্যে জৈব পদার্থ সংশ্লেষণে এবং তা থেকে প্রাণের বিকাশ ও তার বিবর্তনে অতিবেগুনী রশ্মির ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। কিন্তু জীব জগতের সুস্থিতির পক্ষে অতিবেগুনী রশ্মিসহ যে কোন আয়নীকারক বিকিরণ ক্ষতিকর। ওজোনস্তর তৈরী হওয়ার পর ক্রমশ সূর্য থেকে অতিবেগুনী রশ্মির পৃথিবীতে আসা কমতে শুরু করে এবং একসময় কমতে কমতে একটা ন্যূনতম পরিমাণে দাঁড়ায়। এর সাথে সঙ্গতি রেখে জীবজগতে একটা সুস্থিতি তৈরী হয়েছে যা এখনও বজায় আছে। এরপর মানুষ যদি নিজের হাতে ব্যাপক পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী করে ক্রমশ ভূ-পৃষ্ঠে আয়নীকারক বিকিরণের মাত্রা বাড়াতে থাকে, তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা।

প্রথম শুরু হয়েছিল ১৬ জুলাই ১৯৪৫ পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ দিয়ে। তারপর হিরোসিমা-নাগাসাকি। তারপর আরও অসংখ্য পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ (প্রায় ২০০০)। এর সাথে যুক্ত হয়েছে ৩০টি দেশের ৪৪০টি রিয়াক্টর। অনেক তেজস্ক্রিয় আবর্জনা আমরা ইতিমধ্যে তৈরী করে ফেলেছি। সত্যিই কি আমরা নিজেদের অস্তিত্ব নিজেরা বিপন্ন করে তুলছি না ?

বিনিময়- ১ টাকা

বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া-র পক্ষে সম্পাদক দীপক মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও বিভা প্রিন্টিং, সরকার বাজার, হালিসহর থেকে মুদ্রিত।